দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস

এইচ জি ওয়েলস

সূচিপত্র

১. পৃথিবীর ওপর নজর 2

২. দৃশ্যটা অবর্ণনীয় 33

১. পৃথিবীর ওপর নজর

১৮০০-র শেষের কবছরে কাউকে যদি বলা হত, মানুষের চাইতে অনেক বেশি চৌকস প্রাণী পৃথিবীর ওপর নজর রেখে চলেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে–হেসেই উড়িয়ে দিত কথাটা। সত্যি সত্যিই কিন্তু মহাশূন্যে বহু দূরে বসে এই ধরনের প্রাণীরা খর-নজরে দেখে যাচ্ছিল পৃথিবীকে। সেই সঙ্গে ফন্দি এঁটে চলেছিল, কীভাবে আক্রমণ করা যায় আমাদের।

১৮০০-র শেষের দিকে বিশ্বের বেশ কজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেজায় উত্তেজিত হলেন চাঞ্চল্যকর একটা খবর শুনে। মঙ্গল গ্রহের বুকে নাকি একটা বিস্ফোরণ দেখা গেছে। বিশালকায় একটা আগুনের গোলক নাকি বিষম বেগে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। নানান খবরের কাগজে বেরল এই খবর। সাধারণ মানুষ কিন্তু বিচলিত হল না মোটেই। আসন্ন বিপদ উদবিগ্ন করল না কাউকেই।

খবরটা আমার কানে এসেছিল হঠাৎ। ওগিলভি নামে আমার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধু আছে। মানমন্দিরে বসে টেলিস্কোপ দিয়ে সে দেখেছিল ধাবমান অগ্নিগোলককে। রাস্তায় ওগিলভির সঙ্গে মুখোমুখি হতেই ব্যাপারটা বললে আমাকে।

সবশেষে বললে, স্বচক্ষে দেখতে যদি চাও, চলে এসো আজ রাতে। টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে ধাত ছেড়ে যাওয়ার মতো কাণ্ডকারখানা।

শুনেই রীতিমতো উত্তেজিত হয়েছিলাম। বললাম, বেশ তো, আসছি আজ রাত্রে।

সেই রাতেই টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল আর-একটা বিস্ফোরণ। গ্যাসের বিস্ফোরণ। তখন রাত ঠিক বারোটা।

টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ওগিলভিই প্রথমে দেখেছিল সেই বিস্ফোরণ। মঙ্গলের বুকে। চিৎকার করে উঠেছিল বিষম উত্তেজনায়, লালচে ঝলক! কী যেন একটা ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে!

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টেলিস্কোপে চোখ রেখেছিলাম আমি।

এবার দেখেছিলাম সেই আশ্চর্য দৃশ্য!

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঠিকরে যাচ্ছে রক্তরাঙা গ্রহ মঙ্গলের বুক থেকে!

হতভম্ব গলায় বলেছিলাম, ওগিলভি! ওগিলভি! এ কাদের সংকেত? মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের নাকি? সত্যিই কি মঙ্গলে জীব আছে?

ননসেন্স!–বলেছিল ওগিলভি, মঙ্গলের বুকে মানুষের মতো প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা লাখে একটাও নয়। যা দেখছ, তা বোধহয় উল্কাবৃষ্টি অথবা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

মোটের ওপর, ওগিলভির মতো প্রত্যক্ষদর্শী বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না। মঙ্গলগ্রহীরাও বিপুলবেগে ধেয়ে আসতে লাগল পৃথিবীর দিকে দিনে দিনে এগিয়ে আসতে লাগল কাছে... কাছে... আরও কাছে!

মঙ্গল গ্রহ যে রক্তরাঙা লাল গ্রহ, তা আমরা জানি অনেকদিন থেকেই। যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েছি এই গ্রহকে। কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি, সে যুদ্ধ হবে আমাদের সঙ্গেই। সূর্য থেকে চোদ্দো কোটি মাইল দূরে বসেও তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের হালচাল দেখেছে, নিজেদের গ্রহে বসবাস যখনই একটু একটু করে কষ্টকর হতে আরম্ভ করেছে–ফন্দি এঁটেছে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরের পৃথিবী গ্রহটাকে কবজায় আনার।

মঙ্গল আর পৃথিবী কাছাকাছি এসেছিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। ২ আগস্টের খবরের কাগজে বেরল, একটা দারুণ আলোর ঝলকানি নাকি দেখা গেছে মঙ্গলের বুকে, পরপর কয়েক রাত ধরে চলল এই একই ব্যাপার। রাত ঠিক বারোটায় ঝলসিত হয় একটা বিপুল আলোকপিণ্ড–অন্তর্হিত হয় মিনিট পনেরো পরে। স্পেকট্রোস্কোকোপের বর্ণালি দেখে একজন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, মনে হচ্ছে যেন একটা গ্যাসের পিণ্ড জ্বলতে জ্বলতে নক্ষত্রবেগে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে।

ওগিলভির সঙ্গে দেখা হয় ঠিক এই সময়ে। নিস্তব্ধ মানমন্দিরে বসে এক কোণে রাখা ম্যাড়মেড়ে আলোয় রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম দুই বন্ধু। দেখেছিলাম মঙ্গলের বুকে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ঠিক যেন আর-একটা আলোর ডেলা ধেয়ে আসছে এই পৃথিবীর দিকে।

পরপর দশ রাত একই কাণ্ড দেখা গেল রহস্যময় গ্রহ মঙ্গলের বুকে। রাত ঠিক বারোটার সময়ে। তারপর থেকেই কিন্তু রক্তরাঙা গ্রহ শুধু লাল গ্রহই হয়ে রইল–লালের ঝলক দেখিয়ে আর বিড়ম্বিত করেনি পৃথিবীবাসীদের।

কিন্তু আক্কেল গুড়ুম করে দেবার পরিকল্পনা যে চালু হয়ে গেছে, তখনও যদি তা কেউ ভাবতে পারত।

আমি কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভেবেছিলাম। ওগিলভির কথায় মন মানতে রাজি হয়নি। ওই যে অগ্নিঝলক, তা কখনওই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা খসে পড়ার ফলে হচ্ছে না। প্রকাণ্ড কামান দাগলে এমনি ঝলক দেখা যায়। এমনি ধূম্রবলয় ঠিকরে যায়। তবে কি পরপর দশ রাত ধরে গোলার মধ্যে মহাকাশযান পাঠাল মঙ্গলগ্রহীরা পৃথিবীকে টিপ করে?

তারপর এল সেই রাত। পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকরতম রাত। একটা তারা খসে পড়ল আকাশ থেকে। শেষ রাতের দিকে। সবুজ আলোর একটা রেখা দেখা গেছে নাকি খসে পড়া তারার পেছনে। বেশ কয়েক সেকেন্ড সবুজ আলোটা ভেসেছিল আকাশে। একটা হিসহিস শব্দও শোনা গিয়েছিল খসে-পড়া তারা পৃথিবীর দিকে বেগে ধেয়ে আসার সময়ে।

উল্কাপাত নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। কিন্তু টনক নড়েছিল ওগিলভির। ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়েছিল। দেখেছিল, বিশাল একটা সিলিন্ডার বালির মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে আকাশ থেকে বেগে নেমে আসার পর। জমি গর্ত হয়ে গেছে ধাক্কার চোটে। বালি আর পাথর ঠিকরে গিয়ে গোলাকার টিলা বানিয়ে ফেলেছে চারধারে।

উল্কা তো সচরাচর গোলমতো হয়। সিলিন্ডার আকারের তো হয় না। ব্যাস প্রায় নব্বই ফুট। ভেতরে গুড়গুড় করে কী যেন আওয়াজ হচ্ছে। এত গরম যে কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়।

চোঙাটা যে ফাঁপা হতে পারে, এ ধারণা তখনও মাথায় আসেনি ওগিলভির।

স্তম্ভিতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ওগিলভি। দেখেছিল, প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে ফার গাছগুলোকে প্যাঁকাটির মতো ভাঙতে ভাঙতে নেমে এসেছে সিলিন্ডারটা। জঙ্গলেও আগুন লেগেছে। ধোঁয়া উঠছে।

হঠাৎ চমক ভেঙেছিল ওপর থেকে ঝুরঝুর করে কী পড়ছে দেখে। সিলিন্ডারের ওপরের দিকে ছাইয়ের মতো খোসা খসে খসে পড়ছে গর্তের মধ্যে। কেন পড়ছে? একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেই রক্ত জল হয়ে গেল ওগিলভির।

সিলিন্ডারের ওপরের দিকে ঠিক যেন একটা ঢাকনা আঁটা রয়েছে। পেঁচিয়ে আঁটা। আস্তে আস্তে ঘুরছে সেই ঢাকনা। অর্থাৎ প্যাঁচ খুলে যাচ্ছে।

ভেতরে তাহলে কেউ রয়েছে। এখনও মরেনি! চোঙাটাও নিরেট নয়–ফাঁপা!

হয়তো ভেতরে মানুষ আছে, আধমরা মানুষটাকে সাহায্য করা দরকার–এই ভেবেই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে টিলার গা বেয়ে গরম চোঙার দিকে এগিয়েছিল ওগিলভি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকের মতো সম্ভাবনাটা খেলে গিয়ে ছিল মাথার মধ্যে!

মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেনি তো এই সিলিন্ডার? ভেতরে যে বা যারা রয়েছে, মঙ্গল গ্রহের জীব নয় তো তারা?

তবুও গুটিগুটি কাছে গিয়েছিল ওগিলভি। কিন্তু চোঙার গায়ে হাত দিতেই ছ্যাঁকা লেগে গিয়েছিল হাতে। দারুণ গরম। উন্মাদের মতো বেরিয়ে এসেছিল তৎক্ষণাৎ গর্তের বাইরে। সিলিন্ডার পড়ে ছিল শহরের বাইরে ফাঁকা জায়গায়। এখন ঊর্ধ্ব- শ্বাসে ছুটল দূরের শহরের দিকে। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল হেন্ডারসনের সঙ্গে।

হেন্ডারসন পেশায় সাংবাদিক। লন্ডনের একটা খবরের কাগজের রিপোর্টার। বাড়ির সামনে বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল কোদাল দিয়ে।

হন্তদন্ত হয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিল ওগিলভি। বলেছিল চিৎকার করে, হেন্ডারসন, কাল রাতে তারা খসে পড়া দেখেছিলে?

ওগিলভির মতো বৈজ্ঞানিকের এহেন উদ্ভ্রান্ত মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল হেন্ডারসন। বলেছিল সাগ্রহে, দেখেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

–দেখে এলাম জিনিসটাকে।

–কোথায় দেখলে?

–হর্সেল কমনে পড়ে আছে।

চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে হেন্ডারসনের। কোদাল ফেলে দিয়ে বলেছিল রুদ্ধশ্বাসে, উল্কাপিণ্ড! বল কী? চল, চল, দেখে আসা যাক। দৌড়াল দুজনে কমন প্রান্তরের দিকে। যেতে যেতে ওগিলভি হেন্ডারসনকে বললে যা যা দেখেছে এবং শুনেছে।

কথা বলতে বলতেই পৌঁছে গেল উঁচু টিলার ওপর। ওই তো পড়ে রয়েছে মহাকায়। চোঙা। একইভাবে হেলে বেশ খানিকটা গেঁথে গেছে জমির মধ্যে। ধোঁয়ার ফিকে রেশ দেখা যাচ্ছে এখনও। কিন্তু..

ডালাটা প্রায় খুলে এসেছে। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা সোঁ সোঁ শব্দ। যেন হাওয়া ঢুকছে ভেতরে... অথবা বেরিয়ে আসছে বাইরে।

কাছে এগিয়ে গিয়েছিল দুই মূর্তিমান। চোঙার ধাতব দেহে লাঠি ঠুকেছিল ঠনঠন শব্দে। কিন্তু কোনও সাড়াই আসেনি ভেতর থেকে।

গুম হয়ে গিয়েছিল ওগিলভি। বলেছিল চিৎকার করে, ভেতরে যারা আছ, চুপটি করে বসে থাক। আরও লোকজন নিয়ে আসছি।

হেন্ডারসন বলেছিল, বেচারা! ঠান্ডায় জমে গেছে, এমনও হতে পারে।

ঠান্ডায় জমুক আর গরমেই মরুক, নিজেদের দ্বারা আর কিছু সম্ভব নয় দেখে হেন্ডারসন আর ওগিলভি ফিরে এসেছিল শহরে–আরও লোকজন জোটানর আশায়। কোদাল-শাবল নিয়ে আসতে হবে প্রত্যেককে।

হেন্ডারসন তখন ভাবছে। এমন জবর খবরটা আগে পাঠানো দরকার নিজের খবরের কাগজে। তাই আগে টেলিগ্রামে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে দিল সম্পাদককে।

খবরটা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল। খবরের কাগজ কিনতে হকারের কাছে গিয়েছিলাম আমি–চোঙা-সংবাদ শুনলাম তখনই।

কাগজের হকারই বললে, শুনেছেন? তাজা খবর! মঙ্গল গ্রহ থেকে মানুষ এসেছে। বেশি দূরে নয়–ওই কমনে?

অসম্ভব! বলেছিলাম আমি।

বলা বাহুল্য, বিলক্ষণ চমকে গিয়েছিলাম খবরটা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছিলাম নিজের চোখে দেখবার জন্যে। চোঙার চারধারের উঁচু টিলায় ততক্ষণে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। মজা দেখছে। কিছু লোক নেমে পড়েছে গর্তে। গাঁইতি-শাবল দিয়ে চাড় মারছে চোঙার তলায়। অদ্ভুত ধূসর রঙের অজানা ধাতু দিয়ে তৈরি বিশাল সিলিন্ডারটার দিকে চেয়ে ছিলাম আমি ভয়বিহ্বল চোখে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল একজন শাবলধারী, হুশিয়ার! চোঙার ঢাকনা খুলে যাচ্ছে .. পেঁচিয়ে খোলা হচ্ছে ভেতর থেকে।

খুলে গেল ঢাকনা। দড়াম করে পড়ল চোঙার গায়ে। ঝুলতে লাগল চকচকে চাকার মতো।

সভয়ে সরে এসেছিল কৌতূহলী মানুষগুলো। হেঁকে সরিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। কী আছে ভেতরে, তা যখন জানা নেই–তখন তফাত যাওয়াই ভালো।

হতভম্ব চোখে আমি চেয়ে ছিলাম ভোলা গর্তটার দিকে। হেলে-পড়া অদ্ভুত কারুকাজ করা বিশাল সিলিন্ডারের ওপরদিককার ছোট হ্যাঁচের মতো একটা ফোকর হঠাৎ উন্মুক্ত হয়েছে। না জানি এবার কী বিস্ময় আবির্ভূত হবে ফোকর দিয়ে।

মানুষই উঁকি মারবে, আশা করেছিল সবাই। আমি নিজেও তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু ছায়ার মধ্যে দিয়ে যা দেখলাম, তা আর যা-ই হোক–মানুষের চোখ নয়।

গনগনে দুটো বস্তু, গোল চাকার মতো বস্তু, চেয়ে আছে আমাদের দিকে। তারপরেই ধূসর সর্পের মতো কী যেন একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল ফোকরের মধ্যে থেকে লকলকিয়ে শূন্যপথে এগিয়ে এল আমার দিকে।

হট্টগোলটা শুরু হল তৎক্ষণাৎ। বীভৎস ওই শুড়ের লকলকানি দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল যাদের, তাদের মধ্যে সবার আগে গলার শির তুলে চিৎকার করে উঠল একটি মেয়ে। দুদ্দাড় করে পালাতে লাগল যে যেদিকে পারে।

আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলাম থ হয়ে। দাঁড়িয়ে ছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, অক্টোপাসের বাহুর মতো কদর্য শুড় বেরিয়ে আসছে একটার পর একটা। কিলবিল করছে ছোট্ট ফোকরের চারপাশে। শুড় দিয়ে চোঙার গা চেপে ধরে পরক্ষণেই বেরিয়ে এল একটা মূর্তিমান আতঙ্ক!

বীভৎস! কোনও প্রাণী যে এত কদাকার হয়, জানতাম না। ধূসর বর্ণের বৃহৎ বপুটাকে একটু একটু করে এবং বেশ কষ্টের সঙ্গে নিয়ে এল চোঙার বাইরে অমানবিক দুটো বিশাল চক্ষু। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। বিকটাকার চোখ দুটোর দিকে আমিও চেয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে। চোখ প্রত্যঙ্গ দুটো তো মুন্ডুতে থাকে জানি। কিন্তু এর মুন্ডু কোথায়? সবটাই তো ধড়। অথবা ধড়টাই ওর পুরো মগজ। নারকীয় জিঘাংসা-ধকধকে চোখ দুটো বসানো রয়েছে কুৎসিত এই ধড়ের ঠিক মাঝখানে।

পুরো অবয়বটাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে এনে ফেলেছিল পৈশাচিক এই প্রাণী। এবার আচমকা চোঙার গা বেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল নিচের গর্তে। ধুপ করে আছাড় খেতেই কাতরে উঠল অদ্ভুত গলায়। সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা অবিকল বিকট প্রাণী আবির্ভূত হল ফোকরের বাইরে।

দু-দুটো কালান্তক প্রাণীকে কটমট করে চেয়ে থাকতে দেখে প্রাণ হাতে নিয়ে জনতা তখন দৌড়াচ্ছে। দৌড়েছিলাম আমিও। উন্মাদের মতো ধেয়ে গিয়েছিলাম একটা গাছের জটলার দিকে। তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেবার অভিপ্রায় আমার ছিল না মোটেই। লোমহর্ষক ওই চাউনির আড়ালে থেকে দুঃস্বপ্নসম জীবগুলোকে খুঁটিয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি মোটেই।

গাছপালার আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ধুকপুকে বুকে। ভয়ে-বিস্ময়ে দুচোখ যে প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, তা না বললেও চলে। দূর থেকেই দেখেছিলাম, অক্টোপাসের কিলবিলে বাহুর মতো সরু কালো চাবুক যেন আছড়ে পড়ছে সূর্যাস্তের দিকে। তারপর ঠেলে উঠে এল একটা সরু রড। একটার পেছনে আর-একটা জোড়া

লাগিয়ে বেশ লম্বা করে তোলা হল অনেক উঁচুতে। রডের ডগায় বনবন করে ঘুরতে লাগল গোলাকার একটা প্লেট।

হইচই শুনে ফিরে তাকালাম। একদল লোক সাহসে বুক বেঁধে ফিরে এসেছে। গুটিগুটি এগচ্ছে গর্তের দিকে। পুরোধা ব্যক্তির হাতে রয়েছে সাদা নিশান–লাঠির ডগায় বাঁধা। হাওয়ায় উড়ছে পতপত করে।

টিলার ওপর এসে দাঁড়াল ছোট্ট দলটা। ডাইনে-বাঁয়ে পতাকা নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করল মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে।

রডের ডগায় বনবনে ঘুরন্ত চাকাটা আস্তে আস্তে ঘুরে গেল তাদের দিকে...

তারপরেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোর ঝলকে। ভক ভক ভক করে তিনবার সবুজ ধোঁয়া গর্তের ভেতর থেকে ঠিকরে গেল আকাশের দিকে।

খুব ধীরে ধীরে কিম্ভুতকিমাকার একটা আকৃতি উঠে এল গর্তের বাইরে। নিক্ষেপ করল একটা আলোকরশ্মি...

অদ্ভুত আকৃতিটার দিক থেকে বিচ্ছুরিত সেই আলোকরশ্মি এমনই জোরাল যে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। শুধু রশ্মি না বলে তাকে রশ্মিপ্রবাহ বললেই ঠিক হয়। তীব্রবেগে আছড়ে পড়ল বন্ধুত্বের বার্তাবাহী মানুষ কজনের ওপর। নিমেষের মধ্যে শূন্যপথে ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল প্রত্যেকেই–আর নড়ল না। রশ্মিশক্তি এত প্রচণ্ড হয়? এমন সর্বনাশা

হয়? এতখানি মারাত্মক হয়? দাউদাউ করে জ্বলে উঠল পেছনকার পাইনবন—আগুন লকলকিয়ে উঠল শুকনো ঘাসেও।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম আমি। তখন অন্ধকার নেমেছে। অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি নির্মমভাবে তাণ্ডবনৃত্য চালিয়ে যাচ্ছে। কী ভাগ্যিস, আর-একটু এগিয়ে আসেনি। এলে, আমার দফারফাও হয়ে যেত। গাছপালা সমেত পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

অর্ধচন্দ্রাকারে আমার লুকানোর জায়গার ঠিক সামনে দিয়ে সবকিছুতে আগুন লাগাতে ঘুরে গেল অকল্পনীয় সেই আলোকরশ্মি। গাঢ় তমিস্রা শিউরে উঠল যেন অপার্থিব সেই রশ্মি অন্ধকারের বুকে আছড়ে পড়তেই।

আচমকা বিষম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম আমি। দৌড়! দৌড়! দৌড়! অন্ধকারের মধ্যে মাঠের ওপর হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়েও ফের ঠিকরে গিয়ে দৌড়েছিলাম পাগলের মতো।

আমি একাই জীবন নিয়ে শুধু ফিরে এসেছিলাম মৃত্যু-যজ্ঞ থেকে। আমার পেছনে তারার আলোয় গর্তের চারধারে দেখা যাচ্ছিল প্রায় চল্লিশটা মৃতদেহ।

ওগিলভি আর হেন্ডারসনও ছিল ওদের মধ্যে। পাশাপাশি দুজনে পড়ে ছিল নিথর চাহনি আকাশের পানে মেলে ধরে—শান্তির বাণী নিয়ে গিয়ে জীবন আহুতি দিয়েছিল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

তখন, সেই পলায়নের মুহূর্তে, কোনও চিন্তাই আমার মাথায় ছিল না... কারও কথাই ভাবিনি... ভাবতে পারিনি... সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজ করছিল অবর্ণনীয় এক আতঙ্ক... সে আতঙ্কবোধকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু মনে আছে, আমি দৌড়াচ্ছি... দৌড়াচ্ছি... দৌড়াচ্ছি! হোঁচট খাচ্ছি, আছড়ে পড়ছি, তেড়েমেড়ে উঠে আবার ছুটছি। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আতঙ্ক-অঞ্চল থেকে নিমেষে দূরে সরে এসেছি। তারপর পুলের এপাশে রাস্তায় পৌঁছেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। নাক-মুখ কেটে রক্তারক্তি হয়েছিল। বোধহয় বেহুশ হয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

অবশেষে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। টলতে টলতে এবং কাঁপতে কাঁপতে পুল পেরিয়ে গিয়েছিলাম এক হাতে কপাল খামচে ধরে। পেছনে পড়ে ছিল নিস্তব্ধ প্রান্তর। মনে হয়েছিল যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছুটে এলাম এতটা পথ।

কিছু দূর এসে দেখলাম, মেবেরি ব্রিজের ওপর দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটছে একটা রেলগাড়ি যাচ্ছে দক্ষিণদিকে। পাশের উঠোন থেকে বেশ কয়েকজনের কথাবার্তাও কানে এল। সবই চেনা, জানা এবং রোজকার দেখা–কিন্তু এইমাত্র যে লেলিহান মৃত্যুকে ফেলে এলাম পেছনে, তার সঙ্গে মিল নেই কোথাও!

ঢুকলাম শহরে। গ্যাসবাতির তলায় জনাকয়েকের জটলা দেখলাম। এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, কমনের নতুন কোনও খবর আছে কি না। আমার রক্ত-মাখা ধূলিধূসরিত উদভ্রান্ত মূর্তি দেখেই ওরা বুঝেছিল, কোত্থেকে আসছি আমি। তাই পালটা প্রশ্ন করেছিল আমাকে, আপনিই তো আসছেন ওখান থেকে? বলুন তো কী খবর?

খবর খুব খারাপ! মঙ্গল গ্রহের মানুষ এসে নেমেছে প্রান্তরে বলেছিলাম শুষ্ককণ্ঠে।

তাচ্ছিল্যের আর অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল রাস্তার লোকেরা। ধন্যবাদ জানিয়ে সরে পড়েছিল তক্ষুনি। বোধহয় পাগলই ভেবেছিল আমাকে আমার চেহারা দেখে।

মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল আমার। বোকার মতো অত কথা না বললেই হত। টিটকিরি সহ্য করতে হত না। কয়েকজনের পেছন পেছন ধাওয়া করেছিলাম রাগের মাথায়। স্বচক্ষে যা দেখেছি, তার বর্ণনা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেনি।

ভীষণ রেগে তখন বলেছিলাম, টের পাবেন শিগগিরই!

বাড়ি ফিরে এসে বউকে বলেছিলাম, এইমাত্র কী ভয়ানক কাণ্ড দেখে এলাম। টেবিলে রাতের খাবার সাজানো রয়েছে দেখে এক গেলাস সুরাপান করেছিলাম স্নায়ু চাঙ্গা করার জন্যে।

সব শেষে বলেছিলাম, একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল।

কী?–জিজ্ঞেস করেছিল স্ত্রী।

–গর্ত ছেড়ে নড়বে না মঙ্গলগ্রহীরা। ধারেকাছে কেউ গেলেই খতম করে দেবে।

–আসতেও তো পারে এখানে।

–না, না, আসবে না।

–কেন বল তো?

–নড়তেই পারে না। ওই গতর নিয়ে কোনওমতে বেরিয়েছে চোঙার বাইরে–সে যে কী কষ্টে, না দেখলে বুঝবে না। কেন জান? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে তিনগুণ বেশি। তার মানে, একজন মঙ্গলগ্রহীর মঙ্গল গ্রহে যা ওজন, পৃথিবীতে তার তিনগুণ বেশি ওজন। ওজন বাড়ছে, কিন্তু গায়ের জোর তো বাড়ছে না। কাজেই চলতে ফিরতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

খেয়েদেয়ে ধাতস্থ হলাম।

বউ বললে, এতই যদি অসহায় তো এত লোক মারতে গেল কেন?

–আমার তো মনে হয় স্রেফ ভয়ে। ভীষণ ভয় পেলে মাথার কি ঠিক থাকে? হতভাগারা জানে না, বেশি বাড়াবাড়ি করলে গর্তে একটা বোমা ফেলে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ঝাড়েবংশে মারা যাবে প্রত্যেকে।

অনেক কথা হল খেতে খেতে। পরম শান্তিতে ডিনার-পর্ব শেষ করেছিলাম সেই রাতে। তারপর কেটেছে অনেক ভয়ংকর রাত অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। শেষ ডিনারের সেই সুখস্মৃতি ভুলতে পারিনি দুঃসহ উল্কণ্ঠা আর অবসাদের মধ্যে।

উত্তেজনার চোটে কিন্তু সেই রাতে একটা ব্যাপার একেবারেই খেয়াল করিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম–যন্ত্রবিদ্যায় মঙ্গলগ্রহীরা এতই উন্নত যে, নিজেদের শরীর হঠাৎ গুরুভার হয়ে

যাওয়ার বাধা কাটিয়ে নেওয়ার মতো যান্ত্রিক কৌশল নিশ্চয় ভেবে বার করবে। করেওছিল তা-ই। সমস্ত রাত ধরে ধু ধু কমন-প্রান্তরে চলেছিল সেই প্রস্তুতি। বানিয়েছিল একটার পর একটা মেশিন। যে মেশিনে চেপে অথর্ব দেহ নিয়েও তারা নরক। সৃষ্টি করবে সবুজ এই পৃথিবীতে। চোঙার বাইরে এসে গুরুভার দেহ নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে তারা খাড়া করেছিল একশো ফুট উঁচু অদ্ভুত আকৃতির ভয়াল যন্ত্র!

রাত এগারোটা নাগাদ দুদল সৈন্যবাহিনী পৌঁছেছিল কমন প্রান্তরে। প্রান্তর ঘিরে সৈন্য সাজানো হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। অন্ধকারে শুধু ঠাহর করা গিয়েছিল, সারি সারি কামান নলচে ফিরিয়ে রয়েছে গর্তের দিকে। ঘোড়ায় চেপে তদারক করছে সেনাধ্যক্ষরা। সারি সারি সৈনিক বন্দুক হাতে তৈরি। শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

রাত ঠিক বারোটার কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার খসে পড়েছিল একটা তারা। আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় সিলিন্ডার!

পরের দিনটা কেটেছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে। রোজকার মতো সকালে দুধ দিতে এসেছিল গয়লা। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, নতুন কোনও খবর আছে?

সারারাত ধরে মঙ্গলগ্রহীদের ঘিরে রেখেছে আমাদের সৈন্যবাহিনী। খতম করার ইচ্ছে নেই আপাতত। বাড়াবাড়ি করলে অবশ্য মরবে।

দুধের ডোল গয়লার হাত থেকে নিতে নিতে বলেছিলাম, শুনলাম, কাল রাতে আর একটা সিলিন্ডার এসে পড়েছে। একটাতেই রক্ষে নেই, আরও একটা জুটল দেখছি!

যেতে যেতে বলে গিয়েছিল গয়লা, লোকসান তো ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির। ঝুটঝামেলা মেটবার পর ক্ষয়ক্ষতি মেটাতে ফতুর হয়ে যাবে।

প্রাতরাশ খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম কমন প্রান্তরের দিকে। পুলটার কাছেই মুখোমুখি হলাম দুজন সৈনিক পুরুষের সঙ্গে। ব্রিজ আগলে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে।

রুখে দিল আমাকেও, দুঃখিত স্যার, আর এগনোর হুকুম নেই।

গল্প জুড়ে দিলাম ওইখানেই দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, মঙ্গলগ্রহীদের স্বচক্ষে দেখেনি দুজনের কেউই। পাহারাই দিয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বললাম, কী দেখেছি গত রাতে। তাপরশ্মির প্রলয়লীলা বর্ণনা করতে করতে ফের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল নিজেরই।

শুনেটুনে একজন সৈনিক বললে, মাটি ঘেঁষে গুঁড়ি মেরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বুঝবে বাছাধনরা।

অপরজন কাষ্ঠ হেসে বললে, তা না-হয় হল, কিন্তু তাপরশ্মি থেকে গা বাঁচাবে কী করে? ওভাবে হবে না হে–দূর থেকেই কামান দেগে শেষ করে দিতে হবে শয়তানের বাচ্চাদের।

বাড়ি ফিরে এলাম। নতুন খবর আর পেলাম না এত হাঁটাহাঁটি করেও। গরম পড়েছিল বেশ। সস্ত্রীক খেতে বসলাম ঘরের বাইরে–বাগানে।

দিব্যি শান্ত চারদিক। মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। খাচ্ছি নিশ্চিন্ত মনে। আচমকা শোনা গেল গুলিবর্ষণের শব্দ। একই সঙ্গে ভীষণ শব্দে হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ল। এত জোরে, যে মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। জ্বলন্ত মোমবাতি তিনটে ছিটকে গেল টেবিল থেকে। আঁতকে উঠল আমার স্ত্রী।

ভয়বিহ্বল চোখে দেখলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য! কাছের গাছগুলোর চুড়োয় আগুন লাগছে একে একে–নিমেষে নিমেষে জ্বলে উঠছে দাউদাউ করে, আর...

ছোট গির্জের চুড়োটা ভেঙে আছড়ে পড়ছে মাটিতে।

তাপরশ্মি! প্রলয়ংকর তাপরশ্মি ঝলকিত হচ্ছে সবকিছুর ওপর! রাতের অন্ধকার চিরে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে করাল রশ্মির কোপে।

আমার বাড়ি একটা টিলার ওপর। উঁচু থেকে দেখলাম এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য। চকিতে বুঝলাম, যে উচ্চতায় ধেয়ে আসছে ওই রশ্মি, রেহাই দেবে না হয়তো পাহাড়চুড়োর এই বাড়িকেও। নাগালের মধ্যেই রয়েছে যে!

হলও তা-ই। বাগান থেকেই দেখতে পেলাম, বাড়ির মাথায় দুটো লম্বা চিমনির একটা আচমকা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল–ঠিক যেন কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে গেল প্রস্তর চিমনি।

তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলাম রুদ্ধশ্বাসে, অসম্ভব! এখানে থাকা আর যাবে না!

আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে তারস্বরে বলেছিল স্ত্রী, কিন্তু যাবেটা কোথায়?

লেদারহেডে তোমার ভায়েদের বাড়িতে বউকে ঠেলে বাড়ি থেকে বার করতে করতে বলেছিলাম গলার শির তুলে।

পাহাড় থেকে বেগে নামতে নামতেই দেখলাম, টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একদল সৈন্য। দুজন তড়াক করে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হেঁকে বলতে লাগল, পালান! পালান! মঙ্গল গ্রহের আতঙ্করা এদিকেই আসছে!

ঝটপট চলে গেলাম গাঁয়ের সরাইখানায়। মালিকের একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি আছে জানতাম। আস্তাবলেই দেখলাম ভয়ার্ত ঘোড়াটাকে পা ঠুকতে। মালিকও বেরিয়ে এসেছিল আমাকে দেখে।

দ্রুতকণ্ঠে বলেছিলাম, দুপাউন্ড ভাড়া দেব–আজ রাতেই ফিরে পাবেন আপনার গাড়ি ঘোড়া সমেত।

ভাড়াটা খুব বেশি। কাজেই এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল সরাইখানার মালিক। ঝটিতি বাড়ি এসে দরকারি জিনিসপত্র প্যাক করে নিলাম। গাড়িতে এনে রাখলাম। বউকে নিয়ে পাশাপাশি বসলাম চালকের আসনে। চাবুক হাঁকড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম তক্ষুনি।

দেখতে দেখতে এসে পড়লাম পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। ধোঁয়া আর আওয়াজ পড়ে রইল পেছনে। রোদ ওঠার পর দেখলাম, দুপাশের ঝোপে অগুনতি গোলাপ ফুল। মিষ্টি রোদ্দুরে যেন হাসছে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে তাকিয়ে দেখেছিলাম পেছনে। রাশি রাশি কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। ধোঁয়ার মধ্যে থেকে ঝলসে উঠছে লাল আগুন। পূর্ব আর পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তাল তাল ধোঁয়া। তার মানে, মঙ্গলগ্রহীরা নারকীয় উল্লাসে অগ্নিসংযোগ করছে সবকিছুতেই। তাপরশ্মির পাল্লায় যা পড়ছে, ছারখার করে দিচ্ছে বিকট বিধ্বংসী লালসায়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! চোখে জল এসে গেল আমার।

নির্বিঘ্নে পৌঁছালাম লেদারহেডে। সংবর্ধনা জানাল স্ত্রী-র ভায়েরা। ব্যাপার কী জানতে চাইল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই।

সব বললাম। ঘণ্টাখানেক জিরেন দিলাম ঘোড়াটাকে। তারপরে স্ত্রী-কে ওদের হেপাজতে রেখে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির দিকে।

তখন রাত হয়েছে। আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার বেশ গাঢ়। মেঘপুঞ্জও যেন ভারী হয়ে ঝুলে পড়ছে। দরজার আলোর সামনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। স্ত্রী-কে। মুখ সাদা। দূর হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল সেই মূর্তি।

ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেলাম একটার পর একটা বাড়ি। সব বাড়িই কালচে মেরে গেছে। সাড়াশব্দও নেই। চলেছি যেন গোরস্থানের মধ্যে দিয়ে। থমথম করছে চারদিক। ঠিক পেছনেই মধ্যরাতের ঘণ্টা বেজে উঠল একটা গির্জাতে।

আচম্বিতে সবুজ আলোয় সবুজ হয়ে গেল সমস্ত পথ। মাথার ওপরকার মেঘের রাশি চিরে সবুজ আগুন বর্শাফলকের মতো এসে পড়েছে সবুজ পৃথিবীর ওপর। আশ্চর্য সেই আগুন আর আলো দেখেই পলকের মধ্যে বুঝলাম, কী ঘটে গেল।

তৃতীয় সিলিন্ডার এসে পড়ল আমার ঠিক বাঁদিকের মাঠে।

একই সঙ্গে যেন রকেট বিস্ফোরিত হল মাথার ওপর। যুগপৎ বজ্রনাদ আর বিদ্যুতের ঝলকানিতে খেপে গেল আমার ঘোড়া। নক্ষত্রের বেগে ছুটল গাড়ি নিয়ে। বৃথাই রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করলাম আমি।

তুফান মাথায় নিয়ে ধেয়ে গেলাম এইভাবে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আশপাশে, বাজ পড়ছে কড় কড় কড়াৎ শব্দে, ছুঁচের মতো বৃষ্টি বিধছে মুখে। পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। চাবুক মেরেও শায়েস্তা করতে পারছি না। নজর রেখেছি কেবল রাস্তার ওপর। মাঠেঘাটে না নেমে পড়ে।

হঠাৎ দেখলাম, কী যেন একটা সোত করে নেমে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে উলটোদিকে।

যা দেখলাম, তা আমার রক্ত জমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট! বর্ণনা করবার ভাষা কি আমার আছে? লম্বা লম্বা পাইন গাছের মাথা টপকে হনহন করে দৌড়াচ্ছে একটা তেপায়া দানব! মড়মড় করে গাছ ভেঙে যাচ্ছে ঠ্যাঙের ধাক্কায়। চকচকে ধাতু দিয়ে গড়া দেহ! দানব নিঃসন্দেহে–তবে রক্তমাংসের নয়–ধাতুর। বিশাল ইঞ্জিন হেঁটে চলেছে... ছুটে চলেছে... গাছপালা ভেঙে পথ করে নিচ্ছে .. কখনও সখনও লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে টপকে যাচ্ছে।

পরক্ষণেই আমার ঠিক সামনের গাছগুলো দুদিকে সরে গেল–ফাঁকে আবির্ভূত হল আর-একটা ধাতুময় তেপায়া দানব। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি চলেছি ঠিক তার দিকেই!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাগাম টেনে ধরেছিলাম। শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বেচারি অশ্ব। নিমেষমধ্যে তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম ডানদিকে।

আচমকা ওইভাবে বাঁক নিলে দুর্ঘটনা ঘটবে, এ আর আশ্চর্য কী! গাড়ি উলটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওপরের আসন থেকে আমি ঠিকরে পড়লাম রাস্তার পাশে একটা খানায়।

জলে পড়েছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম সে যাত্রা। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে লুকিয়ে রইলাম একটা ঝোপের মধ্যে। আমার পাশ দিয়েই একশো ফুট উঁচু চলন্ত আতঙ্কটা দমাস দুম শব্দে হাঁটতে হাঁটতে উঠে গেল পাহাড় বেয়ে ওপরদিকে।

ঝোপের মধ্যে থেকেই শুনতে পেলাম, হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত চিৎকার করছে তেপায়া দানব, আলু-উ-উ! আলু-উ-উ!

ডাক শুনেই বোধহয় ছুটে এল অন্য দানবটা মুখোমুখি হল দুজনে। আবার অপার্থিব সেই গর্জনে কেঁপে উঠল দিগদিগন্ত।

পাশাপাশি হেঁটে গেল দুজনে মাঠের মধ্যে। হেঁট হয়ে কী যেন খুঁজছে। নিশ্চয় তৃতীয় চোঙার সন্ধানে বেরিয়েছে। দূর থেকে মিনিটকয়েক ধরে দেখে গেলাম তাদের অন্বেষণপর্ব।

তারপরেই গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম খানার মধ্যে থেকে। অন্ধকারে গা ঢেকে পাঁইপাঁই করে দৌড়ালাম পাইন অরণ্যের দিকে।

উদ্দেশ্য আমার একটাই–বাড়ি পৌঁছাতে হবে যেভাবেই হোক। অনেক ছুটে, অনেক কষ্ট করে, অনেক বিপদ পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছালামও।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম বটে, কিন্তু একটু পরেই বাইরে একটা আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

বাগানের অন্ধকারে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তিকে। আমার দিকেই আসছে। একটু এগতেই দেখলাম তার ছন্নছাড়া বেশ। উদভ্রান্ত চেহারা। মঙ্গলগ্রহীদের কবলে পড়েছিল মনে হচ্ছে।

হেঁকে বললাম, ভেতরে আসুন–যদি লুকিয়ে বাঁচতে চান।

যা।–বলে দৌড়ে এল পুরুষমূর্তিটি।

যা।-বলে দৌড়ে এল পুরুষমূর্তিটি।

ঘরের আলোয় তাকে দেখলাম ভালো করে। বললাম সবিস্ময়ে, আপনি সোলজার? ব্যাপার কী বলুন তো?

যেন ককিয়ে উঠল জোয়ান সৈনিক পুরুষ, ব্যাপার অতি ভয়ানক! টিপে মেরেছে বলতে পারেন। মৃত্যু আর ধ্বংসের স্রোত বইয়ে দিয়েছে! কেউ আর বেঁচে নেই!

–বলছেন কী!

কামান গাড়ি চালাই আমি। কামান নিয়ে যাচ্ছিলাম বালির গর্তটার দিকে... একটা গর্তে পা পড়েছিল আমার ঘোড়ার... ছিটকে পড়েছিলাম খানায়–নিষ্প্রভ চোখে ক্লান্ত কণ্ঠে বলে চলে ছন্নছাড়া সৈনিক, আচমকা কামান গর্জন শুনলাম পেছনে–মাথার ওপর দিয়ে শনশন করে চলে গেল গোলার পর গোলা... বিস্ফোরণের আওয়াজে কান যখন ভোঁ ভোঁ করছে, ঠিক তখনই আগুন আর মৃত্যু দেখলাম চারপাশে। তেপায়া দানব!... তেপায়া দানব! মারণ রশ্মি ছুঁড়ে চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে ধ্বংস করে দিল সবকিছু! ও ভগবান! কামান ঠিকরে গেল! মানুষ ছিটকে গেল! ঝলকে ঝলকে রশ্মি এসে আগুন জ্বালিয়ে দিলে চারধারে। মড়ার পাহাড় জমে উঠল আমার ওপর–বেঁচে গেলাম শুধু সেই জন্যেই।

তারপর? তারপর?–রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম আমি।

কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম তারপরেও অনেকক্ষণ। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছিল ভয়ংকর দানবদের কী বিরাট! কী বিকট! বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল কিম্ভুতকিমাকার ওই চেহারা দেখেই।

–শেষ পর্যন্ত হল কী?

-কী আর হবে? গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম মড়ার গাদা ঠেলে... অতি কষ্টে এসেছি এদূর।

সৈনিক পুরুষের ক্লান্ত, অবসন্ন মুখচ্ছবি দেখে মনটা মুচড়ে উঠল আমার। হতাশায় ভেঙে পড়েছে একেবারেই। পরাজয় যে এত নিষ্করুণ হতে পারে, ভাবতে পারেনি কামানচালক। কামানের গোলাও যাদের কিছু করতে পারে না, তারা যে কী বিভীষিকা, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পর।

ওপরতলায় গেলাম দুজনে। জানলা দিয়ে তাকালাম মৃত্যু উপত্যকার দিকে। উষার আলোয় দেখা যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপ। মড়া ছড়িয়ে সর্বত্র। কামানগাড়িগুলো উলটে ভেঙেচুরে পড়ে আছে উপত্যকাময়। যেন খেলনার গাড়ি। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মানুষ আর ঘোড়া, পোড়া গাছ আর ঘাস, ধোঁয়া আর আগুন–যেন শ্মশানভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো উপত্যকাটা। করাল আকৃতি নিয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকটা যন্ত্রদানব।

প্রান্তরব্যাপী মৃত্যুর হাহাকার। চোখে জল এসে গেল দুজনেরই। বেশ বুঝলাম, এ বাড়িও আর নিরাপদ নয়। চম্পট দেওয়া দরকার এখুনি।

সৈনিক পুরুষ বললে, আমি বরং ফিরে যাই আমার বাহিনীতে।

আর আমার কাজ হবে স্ত্রী-কে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া।–বললাম আমি।

পকেট ভরতি খাবারদাবার নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। গাছের পাতা নড়লেও চমকে উঠছি দুজনেই। ঘন ঘন দেখছি আশপাশে–বিশ্বাস নেই। যন্ত্রদানবদের-রশ্মি নিক্ষেপ করতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

ভয়ে কাঠ হয়ে পা টিপে টিপে পেরিয়ে এলাম একটা জঙ্গল। পৌঁছালাম একটা রাস্তায়। দেখলাম, ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একজন সেনাধ্যক্ষ। দূরে সার বেঁধে যাচ্ছে একদল সেনানী।

ছুটে গেল আমার সঙ্গী, স্যার, ফিরে যাচ্ছি আমার বাহিনীতে। মঙ্গলগ্রহীরা কিন্তু এই রাস্তা বরাবর রয়েছে।

দেখতে কীরকম বেটাদের?–ভুরু কুঁচকে শুধায় অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষ।

-ধাতু দিয়ে তৈরি দানব। একশো ফুট উঁচু। আগুন ছুঁড়ে মারে মাথার ওপরকার বাক্স। থেকে।

ননসেন্স!

মোটেই না। সব সত্যি!–পাশ থেকে বললাম আমি।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হল সেনাধ্যক্ষ। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না আমাদের হুঁশিয়ারি। ঠেলা বুঝবেখন রশ্মিবর্ষণ শুরু হলে।

একটু এগতেই দেখলাম, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সৈন্যরা প্রত্যেককে বলছে জিনিসপত্র ফেলে রেখে এখনই চলে যেতে। কিন্তু শুনছে না কেউ। চরমে উঠেছে কথা কাটাকাটি। একজনের বড় মায়া ফুলের টবগুলোর ওপর। ব্যাগ ভরতি করে নিয়েছে। কড়া গলায় বারণ করছে। একজন সোলজার। কিন্তু কে কার কথা শোনে। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু

নিয়ে যেতে চায়। বাড়ি থেকে, অথচ খালি হাতে এখুনি তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেওয়ার হুকুম দিয়ে যাচ্ছে সোলজাররা। হট্টগোলে কান পাতা দায়।

ফুলের টব না নিয়ে যে যাবে না, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ধমক দিয়ে বললাম, রাস্তার ওদিকে, জঙ্গলের ওপারে কী আছে জানেন?

না তো? টবগুলো আঁকড়ে ধরে অসহায়ভাবে বললে ফুল-পাগল লোকটা।

মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু! তেড়ে আসছে এদিকে। তীব্রস্বরে ফেটে পড়েছিলাম মৃত্যু-উপত্যকার মাঝে টহলদার যন্ত্রদানবগুলোর কথা মনে পড়তেই।

রাত হল। আকাশে তারা ফুটল। একটা মাঠের ওপর ছটা বিরাট কামানের পাশে গোলন্দাজদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মাঠের শেষ প্রান্তেও সারি সারি কামান আর সৈন্য দেখা যাচ্ছে তারার ম্লান আলোয়।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম গোলন্দাজবাহিনীর কথাবার্তা।

–একটা-না-একটা গোলা খেতেই হবে বাছাধনদের।

বিদ্যুতের চেয়েও জোরে ছোটে এই কামানের গোলা–ঠেলাটা বুঝবে এবার।

থমকে দাঁড়ালাম সেনাধ্যক্ষের পাশে। বয়স্ক পুরুষ। এক মুখ দাড়ি। চোখ কঠোর। চাহনি দূরে নিবদ্ধ। কথা বলছে আপন মনে। আত্মবিশ্বাস ক্ষরিত হচ্ছে প্রতিটি শব্দ থেকে।

থামাবই–এই মাঠ পেরিয়ে আর এগতে হচ্ছে না লন্ডনের দিকে। কামানে কামানে ছেয়ে রাখা হয়েছে এখান থেকে লন্ডন পর্যন্ত। সব কটাকেই শেষ করব এখানেই।

আত্মশ্লাঘার অবসান ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে। আচম্বিতে মাটি কাঁপিয়ে অন্ধকার প্রান্তরে আবির্ভূত হল তিনটে প্রকাণ্ড যন্ত্রদানব। রুখে দাঁড়াল গোলন্দাজবাহিনী।

আমরা কিন্তু দৌড়াচ্ছিলাম। প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়ালাম। নিরস্ত্র কোনও নাগরিকই দাঁড়িয়ে রইল না ভয়াবহ লড়াইয়ের পরিণতিটা দেখবার জন্যে।

পেছন ফিরে আমি কিন্তু দেখেছিলাম, একসঙ্গে গর্জে উঠেছে ছটা কামান। শূন্যপথে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাচ্ছে কয়েকটা বোমা। শনশন করে যন্ত্রদানবদের আশপাশ দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে কামান-নিক্ষিপ্ত ধ্বংসদূতেরা। তারপরেই একটা গোলা আছড়ে পড়ল একটা ধাতুময় তেপায়া দানবের ওপর–নির্ভুল লক্ষ্যে!

অগ্নিঝলকে ক্ষণেকের জন্যে দেখেছিলাম, কালো কালো ছায়ামূর্তির মতো গোলন্দাজবাহিনী ক্ষিপ্তের মতো কামানের নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেল দেগে যাচ্ছে। অনেক উঁচুতে রক্ত-জমানো আকৃতি নিয়ে মহাকায় একটা তেপায়া দানব তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বলে। দূরে, পেছনে দেখা যাচ্ছে, নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে আরও দুটো বিদঘুটে দানব। ঠিক সেই সময়ে একদম সামনের কিম্ভুত আকৃতিটার একটা পা খানখান হয়ে গেল শেল বিস্ফোরিত হতেই। দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হল অগ্নিঝলক–টুকরো টুকরো যন্ত্রাংশ ঠিকরে গেল আশপাশে।

জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল সেনাবাহিনী। এই প্রথম ঘায়েল করা গেছে একটা দানবকে! সত্যিই ঘায়েল হয়েছে অজেয় যন্ত্রদানব। মারাত্মক চোট পেয়েছে। ভাঙা পায়ের ওপর বিরাট দেহটা টলমল করে উঠেই আছড়ে পড়ল দড়াম করে।

মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু বিপর্যয় ঘটিয়ে ছাড়ল জখম যন্ত্রদানবের সঙ্গী দুজন। তাপরশ্মি বর্ষিত হল ঝলকে ঝলকে সেনাবাহিনীর ওপর। কামান-বন্দুক-গোলাবারুদে আগুন ধরে গেল চক্ষের নিমেষে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল সঙ্গে সঙ্গে। ভয়াবহ সেই বিস্ফোরণের তুলনীয় বিস্ফোরণ জীবনে কখনও শুনিনি বা দেখিনি। সৈন্যসামন্ত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল ওই একটা বিস্ফোরণেই। অগ্নিঝলকের মধ্যে দিয়ে শুধু দেখলাম, বহু উঁচুতে ঠিকরে যাচ্ছে। সৈন্যদের লাশ!

সব শেষ! নিমেষমধ্যে যুদ্ধ খতম। খুব যে বড়াই করেছিল সেনাধ্যক্ষ-মৃত্যু যে এমন অতর্কিতে আসতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি। জানি না, এই মুহূর্তে তার পিঞ্জরশূন্য নশ্বর দেহটা আস্ত অবস্থায় আছে, না টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের নানা দিকে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মৃত্যু নেই কি তেপায়া দানরের? ভূপাতিত যন্ত্রদানবের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল বিকটাকার একজন মঙ্গলগ্রহী। কদাকার সেই দেহ-কমন প্রান্তরে যা দেখে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। সেই বীভৎস চোখ। সেই কিলবিলে শুড়। গুটিগুটি বেরিয়ে এসে যন্ত্রপাতি মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত হল মাঠের মধ্যেই। আমরা পৃথিবীর মানুষরা ছেঁড়া কাপড় যেভাবে সেলাই করে নিই ছুঁচ দিয়ে অনায়াসে, খণ্ডবিখণ্ড যান্ত্রিক পা খানাকেও সেইরকম অতি সহজে ঠিক করে নিল বিদঘুটে মঙ্গলগ্রহী। তুখড় কারিগর

বটে। যন্ত্রশিল্পে কতখানি দক্ষতা থাকলে এত সহজে এত কম সময়ে মেশিন মেরামত করা সম্ভব হয়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ভগ্নপদ ঠিক হয়ে যেতেই এক ঝটকান দিয়ে ফের সিধে হয়ে দাঁড়াল যন্ত্রদানব!

গুলি-বারুদ-কামান-বন্দুক ফেটে উড়ে যেতেই এবং একই সঙ্গে আশপাশের বনভূমিতে আর ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যেতেই লোকজন পালিয়েছিল যে যেদিকে পারে। পালিয়েছিলাম আমিও। তারপর একটা ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ক্লান্ত দেহে। প্রান্তর জুড়ে তখন বিরাজ করছে ধোঁয়া আর আগুন। উকট গন্ধেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি আমার–এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম সেই রাতে।

ঘুম ভাঙার পর দেখলাম, আমার পাশে বসে একজন পাদরি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল আমার। শুষ্ক কণ্ঠে জল চেয়েছিলাম তার কাছে। বিষমুখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে পাদরি জানিয়েছিল, জল-টল কিছুই নেই তার কাছে। পরক্ষণেই ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুঁড়ে সে কী চিৎকার–মাথাটা সাফ করবার জন্যে পায়চারি করছিলাম মশায়–হঠাৎ এ কী কাণ্ড! আগুন, ভূমিকম্প, মৃত্যু!

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম আমি। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি পাদরি সাহেবের? দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে আপন মনে–শেষ... শেষ... পৃথিবীর শেষ! পাপে ভরে উঠেছিল এই পৃথিবী। তাই শেষ হয়ে গেল মানুষ জাতটা।

বেশ বুঝলাম, নারকীয় কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখে মাথাটাকে বিগড়ে বসে আছে পাদরিসাহেব। পাগল হয়ে গেছে একেবারেই বদ্ধ উন্মাদ!

অন্ধকারের মধ্যে পাগলের প্রলাপ আরও কতক্ষণ শুনতে হত জানি না, আচমকা টনক নড়ল দুরে দুটো চলমান তেপায় দানবকে দেখে।

মনে পড়ল সেই সেনাধ্যক্ষের স্বগতোক্তি। লন্ডন পর্যন্ত সর্বত্র কামান সাজানো আছে যন্ত্রদানবদের রুখে দেওয়ার জন্যে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে অনেকটা পথ এসেছি ঠিকই, কিন্তু ঝোপেঝাড়ে নিশ্চয় ওত পেতে আছে কামান আর গোলন্দাজবাহিনী। এখনই শুরু হবে গোলাবর্ষণ। প্রচণ্ড নির্ঘোষে এখনই খানখান হয়ে যাবে রাতের নৈঃশব্দ্য। যন্ত্রদানবরা যতই শক্তিধর হোক-না কেন, অপরাজের যে নয়, তার প্রমাণ তো দেখেই এসেছি। তাক করে আঘাত হানতে পারলে ওদের ধরাশায়ী করতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এ কী হাল! রশ্মিবর্ষণের ধার দিয়েও যে গেল না বিকট দানবরা। ভেবেছিলাম, মারণরশ্মি ঝলকে ঝলকে নিক্ষিপ্ত হবে কামানবর্ষণ শুরু হলেই। কিন্তু তার আগেই আর একটা সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করল মঙ্গলগ্রহীরা।

কালো ধোঁয়া!

২. দৃশ্যটা অবর্ণনীয়

দৃশ্যটা অবর্ণনীয়। লম্বা লম্বা পাইন গাছকে অবলীলাক্রমে টপকে বেরিয়ে এল তেপায়া দানবরা। পরক্ষণেই প্রত্যেকের মাথার বাক্স থেকে তীব্রবেগে ঠিকরে এল কালো ধোঁয়া। দু-চারটে কামান গর্জে উঠেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষ-পোকাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকা- নো রয়েছে ঠিক কোন জায়গাগুলোতে, মঙ্গলগ্রহী- রা জেনে গিয়েছিল সেই কারণেই। ধোঁয়া নিক্ষেপ করলে ঠিক সেই সেই দিকে।

মারাত্মক সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল জমি ঘেঁষে। উপত্যকায় দিকে দিকে গড়িয়ে গিয়ে ঢুকে গেল প্রতিটা খাঁজে খাঁজে, ফাঁকে, ফোকরে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ-ধোঁয়া ফুস-ফুঁসে প্রবেশ করতেই মরণের কোলে ঢলে পড়ল আমাদের সেনানীরা। নিস্তব্ধ হয়ে গেল কামানগুলো। নিস্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত প্রান্তর। ঘন কালো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল চারদিক। বাড়িঘরদোর পর্যন্ত ঢেকে গেল কালো ধোঁয়ায়। ঘরের মধ্যে থেকেও রেহাই পেল না আবালবৃদ্ধবনিতা। চকিত মৃত্যু সবাইকেই নিয়ে গেল পরলোকে।

নিষ্ঠুর মৃত্যুদূতেরা দাঁড়িয়ে রইল কেবল প্রান্তরের মাঝে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যেতেই, প্রাণের সমস্ত স্পন্দন চারদিকে থেমে যেতেই স্তব্ধ করল কালো ধোঁয়াবর্ষণ। পিচকিরির মতো এতক্ষণ যে ধূমপুঞ্জ তীব্রবেগে ধেয়ে যাচ্ছিল দিকে দিকে, অকস্মাৎ তা বন্ধ করে দিয়ে ধোঁয়ার ওপর ছিটিয়ে দিলে বাষ্পধারা। গরম বাষ্প মুহূর্তের মধ্যে সাফ

করে দিল মাটি ঘেঁষে গড়িয়ে-যাওয়া তাল তাল বিষধোঁয়াকে। পরিষ্কার হয়ে গেল মৃত্যু উপত্যকা!

চলল এইভাবেই। পোকামাকড়ের বাসায় ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ যেভাবে বাসা পরিষ্কার করে নেয়, মঙ্গলগ্রহীরা ঠিক সেইভাবে বিষ-গ্যাস ছড়িয়ে দিতে লাগল লন্ডনের দিকে এগনোর সময়ে। একশো ফুট উঁচু বাক্সে বসে হারামজাদারা ঠিক আঁচ করে নিয়েছে, কোথায় কোথায় লুকানো আছে কামান আর সৈন্য–কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়েছে ঠিক সেইখানে। ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ রচনা করে বীরদর্পে এগিয়ে গেছে জনবহুল লন্ডন শহরের দিকে। বাধা পায়নি কোথাও। বাধা দেওয়ার মতো বেঁচে ছিল না কেউ। মৃত্যুর হাহাকার পর্যন্ত শোনা যায়নি কোনওখানে। তেপায়া দানবরা এসেছে চকিতে, প্রাণের প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছে নিমেষে। গণহত্যা চালিয়ে গেছে নির্মমভাবে।

অচিরেই নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল লন্ডনবাসীরাও। খবর পৌঁছেছে সেখানেও। পোকামাকড়দের মতো মানুষ মারতে মারতে বিকটদর্শন যন্ত্রদানবদের চালিয়ে নিয়ে আসছে মঙ্গলগ্রহীরা–এ খবর সেখানে পৌঁছাতেই শিউরে উঠল প্রতিটি মানুষ। এখন উপায়?

লন্ডনের গণ-আতঙ্ক কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল, পরে তা শুনেছিলাম আমার ভাইয়ের মুখে। ও তখন লন্ডনেই ছিল। সকালের দিকে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল, খবরের কাগজ ফিরি করছে কাগজওয়ালা। আর চেঁচিয়ে যাচ্ছে তারস্বরে–বিপদ! বিপদ! দম আটকে মৃত্যু! কালো ধোঁয়া!

কাগজ নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই থ হয়ে গিয়েছিল আমার ভাই। প্রধান সেনাপতির হুশিয়ারি ছাপা হয়েছে বড় বড় করে–তলায় মঙ্গলগ্রহীদের ধ্বংসযজ্ঞের লোমহর্ষক ফোটোগ্রাফ।

কমান্ডার-ইন-চিফ বলেছেন, বিষ-ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে দিচ্ছে মঙ্গলগ্রহীরা। নিশ্চিহ্ন করেছে সৈন্যবাহিনীকে। এগচ্ছে লন্ডনের দিকে। পালানো ছাড়া বাঁচার পথ আর নেই!

ফলে, প্যানিক ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা লন্ডন শহরে। ষাট লক্ষ নগরবাসী একই সঙ্গে লন্ডন ছেড়ে ছুটল উত্তরদিকে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। যত দূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে প্রাণপ্রিয় শহর ছেড়ে অন্য গ্রহ থেকে মাত্র জনাকয়েক আগন্তুক আততায়ীর ভয়ে। তাদের চোখে দেখেনি কেউই–শুধু শুনেছে বর্ণনা। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে অসামান্য কাণ্ডকারখানা শুনেই। সুতরাং দে চম্পট! দে চম্পট! দে চম্পট!

খালি হয়ে গেল লন্ডন শহর। আমার ভাই কোনওমতে পৌঁছাল নদীর ধারে। জাহাজে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। এত লোক উঠেছে এবং তখনও উঠছে যে, জাহাজটাই না ডুবে যায়। যারা উঠতে পারেনি, তাদের চেঁচামেচি-হট্টগোলে কানের পোকা বেরিয়ে যায় আর কী! ভায়া আমার এদিকে খুব চৌকস। অত ভিড়ের মধ্যেও নিজের জায়গা করে নিয়ে- ছিল জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গে চিমনি দিয়ে গলগলিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে জাহাজ সরে এসেছিল তীর থেকে তফাতে। আর ঠিক তখনই বহু দূরে দেখা গিয়েছিল দীর্ঘ-দেহী এক যন্ত্রদানব-কে। বহু দূরে থাকায় তখনও কালো বিন্দুর মতো মনে হচ্ছিল

ঠিকই, কিন্তু যেভাবে বাড়িঘরদোর, কার- খানা টপকে এগিয়ে আসছিল, তাতেই বোঝা গিয়েছিল তেপায়া দানব লম্বায় কতখানি।

জাহাজ থেকে বহু দূরের সেই চলমান বিভীষিকাকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল আমার ভায়ের। শোনা কথা যে এতখানি বুক-কাঁপানো সত্যি হতে পারে, হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছিল। সেই প্রথম স্বচক্ষে মঙ্গলগ্রহীদের যন্ত্রদানব দেখেই নাকি ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল জাহাজসুদ্ধ প্রত্যেকেরই।

তেপায়া দানবের দল দেখতে দেখতে এসে পৌঁছেছিল জলের ধারে। জাহাজ ভরতি মানুষ পালাচ্ছে দেখে লম্বা লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে জলেও নেমে পড়েছিল। তাড়া করেছিল পেছনে। ফুল স্পিডে জাহাজ চালাতে হুকুম দিয়েছিলেন ক্যাপটেন। থরথর করে কাঁপছিল চিমনি আর গোটা জাহাজটা পুরোদমে ইঞ্জিন চলায়। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছিল যেন। শামুকের গতিতে যাচ্ছে জাহাজটা–অবিশ্বাস্য বেগে পেছনে তাড়া করে আসছে করাল যন্ত্রদানব!

আচমকা কাত হয়ে পড়েছিল জাহাজ। তাল সামলাতে না পেরে ঠিকরে পড়েছিল আমার ভাই। পরক্ষণেই দেখেছিল, প্রায় একশো গজ দূর দিয়ে একটা লোহার জাহাজ জল তোলপাড় করে ছুটে যাচ্ছে আগুয়ান বিভীষিকা-র দিকে।

দেখেই উল্লসিত হয়েছিল আমার ভাই। চিনতে পেরেছিল জাহাজটাকে। টর্পেডোবাহী যুদ্ধজাহাজ। সোজা তেড়ে যাচ্ছে তেপায়া দানবের দিকে।

তারপরেই শোনা গিয়ে ছিল যেন বজ্রনির্ঘোষ। গর্জে উঠেছিল টর্পেডো কামান। তাল তাল ধোঁয়া ঠিকরে গিয়েছিল কালো জলের ওপর দিয়ে–অন্ধকারের বুক চিরে নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গিয়েছিল সাক্ষাৎ যমদূত–বিস্ফোরকে ঠাসা টর্পেডো!

আচমকা উৎপাতকে সটান ধেয়ে আসতে দেখে যন্ত্রদানবও সজাগ হয়ে গিয়েছিল এবং রশ্মিবর্ষণ করেছিল পলকের মধ্যে।

ফলটা হল ভয়ানক। পিলে চমকে গিয়েছিল আমার ভায়ার।

লৌহনির্মিত অমন মজবুত গোটা যুদ্ধজাহাজটা ফেটে চৌচির হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে ছিটকে পড়ল চক্ষের নিমেষে। রশ্মিঝলকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড ঝলসানিতে। সে কী ফ্ল্যাশ! যেন লক্ষ বিদ্যুৎ একযোগে আছড়ে পড়েছিল লোহার জাহাজটার ওপর।

পরের মুহূর্তেই দেখা গেল জাহাজ নিশ্চিহ্ন। পেছনে দাঁড়িয়ে কুটিল যন্ত্রদানব। যেন কিছুই হয়নি, ছেলেখেলা করে গেল এইমাত্র!

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছিল ছোট্ট জাহাজের ক্যাপটেন। ফুল ফোর্সে ইঞ্জিন চালিয়ে মানুষ-ঠাসা জলযানকে নিয়ে গিয়েছিল বার-সমুদ্রের দিকে।

অন্ধকার যখন বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল, চিৎকার শোনা গিয়েছিল ক্যাপটেনের কণ্ঠে। আঙুল তুলে কী যেন দেখাচ্ছেন বহু দূরে।

জাহাজসুদ্ধ লোক তাকিয়েছিল সেদিকে। দেখেছিল, তারাভরা আকাশকে সবুজ আলোয় ঝলসে দিয়ে চতুর্থ সিলিন্ডার নেমে যাচ্ছে ধরিত্রীর বুক লক্ষ্য করে–পেছনে রেখে যাচ্ছে। সবুজ আলোর রেখা–প্রোজ্জ্বল এবং অশুভ।

লন্ডনে যখন এই কাণ্ড চলছে, পলায়নের হিড়িক উঠেছে, মূর্তিমান মেশিন দানব আবির্ভূত হয়ে লৌহ রণতরিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ছাড়ছে–ঠিক সেই সময়ে ক্ষিপ্তমস্তিষ্ক পাদরি সাহেবের সঙ্গে প্রাণের ভয়ে আমি লুকিয়ে আছি একটা খালি বাড়িতে। বাড়ির মালিক সবকিছু ফেলে-ছড়িয়ে পালিয়েছে প্রাণের মায়ায়–আমরা ঠাঁই নিয়েছি পরিত্যক্ত সেই গৃহে প্রাণপাখিকে পিঞ্জরে ধরে রাখার প্রয়াসে।

পাদরি সাহেব দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে এক কোণে। বকবক করেছে অনেকক্ষণ। কাঁহাতক আর মুখের গ্যাঁজলা উঠিয়ে চেঁচাবে? ঝিমিয়ে পড়েছে সেই কারণেই। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্ত চরণে ঘুরঘুর করছি। পরিত্যক্ত বাড়িটাকেই দুর্গ বানিয়ে বাঁচবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তখনও নিশার অবসান ঘটেনি। রাতের তারা বিদায় নেয়নি। জানলা থেকে উঁকি মেরে কিন্তু দেখলাম, কালো ধোঁয়ার ছিটেফোঁটাও আর নেই কোথাও। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষদের নিকৃষ্ট কীটের মতোই যারা নিঃশেষে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, মৃত্যুরূপী কালো ধোঁয়ার অপসারণ ঘটিয়েছে তারাই গরম বাষ্পর পিচকিরি দিয়ে। তাজ্জব প্রাণী বটে! বিষ-ধোঁয়া ছাড়বারই বা কী দরকার ছিল –আবার তাকে ধুয়ে দিয়ে মেদিনীকে নির্মল করারই বা কী প্রয়োজন ছিল!

ওই সময়ে অবশ্য এত কথা আমি ভাবিনি। ভাববার মতো অবসর বা মনের অবস্থা ছিল না। যেই দেখলাম বিষ ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, অমনি বললাম পাদরিকে, এই সুযোগ! এবার বেরিয়ে পড়া যাক!

আঁৎকে উঠল বৃদ্ধ পাদরি; না! না! এখানেই বেশ আছি।

কিন্তু আমি তো জানি, যেতে আমাকে হবেই। এ জায়গা এই মুহূর্তে যত নিরাপদই হোক-না কেন, অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানি না। তা ছাড়া, আমাকে যেতে হবে স্ত্রী র খোঁজে। সে বেচারার কী হাল হল, না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমার।

সুতরাং পাদরিকে আমার অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এলাম ভাঙাচোরা বাড়ির বাইরে। পেছন পেছন দৌড়ে এল পাদরি সাহেব। একা একা এই নরকপুরীতে থাকতে সে রাজি নয়।

কিছু দূর গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম বিষম ভয়ে!

রাস্তা বেয়ে লোকজন পালাচ্ছে ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু পলায়মান জনতার মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একশো ফুট উঁচু একটা যন্ত্রদানবকে। নির্বিকারভাবে চলেছে হনহন করে। যেন এ পৃথিবীটা তাদেরই। মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছে। এখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

খটকা লাগল একটু পরেই।

তাপরশ্মি বর্ষণ করছে না কেন ভীমাকার যন্ত্রদানব? লোকজন প্রাণভয়ে ছুটছে তো তার সামনে দিয়েই। লম্বা লম্বা পাইন গাছের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকেই নজর রেখেছে করাল আকৃতিটা–অথচ তাপরশ্মি ছুঁড়ে নিকেশ করে দিচ্ছে না কাউকেই!

ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা যে কী ভয়ানক, তা অচিরেই দেখতে পেলাম স্বচক্ষে এবং শিউরে উঠলাম যন্ত্রদানবদের এহেন আচরণের মূল উদ্দেশ্যটা অনুধাবন করতে না পেরে!

পলায়মান জনতাদের মধ্যে থেকে একটা একটা করে লোককে খপ করে শুড়ের ডগায় তুলে নিচ্ছে যন্ত্রদানব এবং নিক্ষেপ করছে পিঠের ধাতু-খাঁচায়!

কেন? না মেরে জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? জবাবটা জেনেছিলাম পরে এবং তা এমনই নারকীয় ব্যাপার যে, লিখতে আমার কলম সরছে না। মানুষ জাতটা খাবার খেতে যে সময়টা নষ্ট করে, মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা তা-ও করে না। তারা জ্যান্ত মানুষের রক্ত টেনে নিয়ে নিজেদের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। বাকি সময়টা শুধু কাজ করে যায়।

টপাটপ করে তোক তুলে পরিত্রাহি চিৎকার সত্ত্বেও খাঁচার মধ্যে ফেলছে দেখেই কিন্তু বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল আমার হাতে-পায়ে। পাঁইপাঁই করে দৌড় দিয়েছিলাম পেছন ফিরেই। কোথায় যাচ্ছি, পথে কী আছে–অত দেখিনি। অন্ধকারে দেখা সম্ভবও ছিল না। ফলে, ঝপাত করে দুজনেই ঠিকরে পড়লাম একটা খানার মধ্যে।

তখন শেষ রাত। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে খানার জলেই ঘাপটি মেরে থাকা সমীচীন বোধ করলাম–এর চাইতে নিরাপদ জায়গা আপাতত বাইরে আর কোথাও নেই। গাঢ় তমিস্রায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই কিন্তু সেইটাই তো আমাদের পরম নিরাপত্তা। হতচ্ছাড়া যন্ত্রদানবরাও তো দেখতে পাবে না জলজ্যান্ত এই দুটো মানুষকে।

অনেকক্ষণ পরে হট্টগোল থেমে যাবার পর গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম খানার মধ্যে থেকে। রাস্তা এড়িয়ে গেলাম। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পা টিপে টিপে এগলাম। বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল প্রতি পদক্ষেপে।

খিদে পেয়েছিল খুবই। সামনে একটা খালি বাড়ি দেখে ঢুকে পড়লাম তার মধ্যে। তেষ্টাও পেয়েছে বিলক্ষণ। হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় পেলাম রুটি আর শূকর মাংস। পাদরি পেয়ে গেল তৃষ্ণানিবারণের জল।

পরমানন্দে খাওয়াদাওয়া করছি দুই পলাতক পৃথিবীবাসী, আচম্বিতে এ কী কাণ্ড! চোখ ধাঁধিয়ে গেল অতি তীব্র সবুজ দ্যুতিতে–আলোর ঝলক নেমে এল আকাশ থেকে–নিমেষে দূরীভূত করল ভাঙা ঘরের প্রতিটি কোণের তমিস্রাপুঞ্জ। পরক্ষণেই শুনলাম পিলে-চমকানো একটা বিস্ফোরণের শব্দ। সে কী ভয়াবহ আওয়াজ। কানের পরদা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো অনেক ভয়ংকর বিকট আওয়াজ শুনেছি এই জীবনে, কিন্তু এরকম হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করা নিনাদ তো কখনও শুনিনি! গায়ের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে গেল রক্ত ছলকে দেওয়া সেই বিপুল সংঘাত-শব্দে। ছিটকে গেলাম শূন্যে–ছিটকে গেল সবকিছুই।

বলা বাহুল্য, সংবিৎ হারিয়েছিলাম আচমকা সেই প্রলয়কাণ্ডে। জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলাম কতক্ষণ পরে, তা বলতে পারব না। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। তমালকালো আঁধারে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে আছি আমি। পাশের দিকে কাতরানি শুনে বুঝলাম, ঘোর কাটিয়ে উঠেছে পাদরিসাহেবও।

ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে কথা বলতেও পারিনি। চাপা গলায় ধমক দিয়েছিলাম, চুপ! একদম নড়বেন না। বাইরেই রয়েছে ওরা–টের পাচ্ছেন?...

পাদরি টের পাক আর না-পাক, হাড়ে হাড়ে আমি টের পেয়েছিলাম, মঙ্গলগ্রহীদের কদাকার অস্তিত্ব রয়েছে অতি সন্নিকটে। ব্যাপারটা কী ঘটে গেল, তা-ও আঁচ করে নিয়েছিলাম। আর-একটা চোঙা মঙ্গল গ্রহ থেকে উড়ে এসে আছড়ে পড়ল বাড়ির খুব কাছেই। সাঁই সাঁই করে উড়ে যাওয়ার সময়ে এ বাড়িরও দফারফা করে দিয়ে গেছে, জিনিসপত্র আস্ত নেই কিছুই। কড়িকাঠ হেলে পড়েছে। দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। প্রাণে যে বেঁচে আছি এখনও এইটাই আশ্চর্য।

সকাল না-হওয়া পর্যন্ত আঙুল নাড়বার সাহসও পেলাম না। তারপর অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে গেলাম ভাঙা দেওয়ালের একটা ফুটোর কাছে। ফুটো দিয়ে বাইরে তাকাতেই ছলাত করে উঠল বুকের রক্ত।

বিকটদেহী অতিশয় কদাকার একটা মঙ্গলগ্রহী জ্বলন্ত চোখে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে সদ্য অবতীর্ণ বিশাল সিলিন্ডারটাকে।

পঞ্চম সিলিন্ডার। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই। পঞ্চম চোঙা উল্কাবেগে ধেয়ে এসে তেরচাভাবে এই বাড়ির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেঁথে গেছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ভগ্নগৃহের নিচে কবরস্থ হতে চলেছি আমরাও!

অস্ফুট কাতরানি শুনলাম কানের কাছে পাদরির ভাঙা গলায়–হা ঈশ্বর! রক্ষে কর!

আর ঈশ্বর! ঈশ্বর আছেন কি নেই–এই সন্দেহটাই সেই মুহূর্তে দেখা দিয়েছিল মনের মধ্যে। এ কী অনাচার! অকারণে ভিনগ্রহীদের এ কী অত্যাচার! একটার পর একটা চোঙা নামিয়ে চলেছে শ্যামল সবুজ পৃথিবীর বুকে–তারপরেই তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। ঈশ্বর! তুমি কি সত্যিই আছ?

ঈশ্বর যে আছেন, সব দেখছেন এবং দণ্ড দেওয়ার আয়োজন করে চলেছেন–তা বুঝেছিলাম পরে।

তখন কিন্তু আতঙ্কে বিবশ হয়ে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারিনি। সে যে কী কষ্ট, তা আমি কোনওদিনই লিখে বোঝাতে পারব না... পারব না... পারব না!

অনেক... অনেকক্ষণ পরে খিদের জ্বালা অনুভব করেছিলাম নাড়িতে... বত্রিশ নাড়ি মোচড় দিয়ে উঠতেই আতঙ্কের নাগপাশ খসিয়ে গুটিগুটি খুঁজে বার করেছিলাম রান্নাঘর। সে ঘরের ভগ্নদশাও চোখে জল এনে দেয়। প্রকাণ্ড চোঙার এক ধাক্কাতেই পুরো বাড়িটাই বসে গেছে মাটির মধ্যে। খুঁজেপেতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খাবার খেতে খেতে ফাটল দিয়ে দেখে গেলাম, শয়তানের চেলার মতো কুৎসিতদর্শন মঙ্গল গ্রহের প্রাণীগুলো কীভাবে বানিয়ে চলেছে নারকীয় মেশিনের পর মেশিন। ওইরকম জড়ভরত শরীর নিয়ে এত

দ্রুতও কাজ করতে পারে শয়তানগুলো। সারাদিন ধরে কাজই করছে-বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই–একনাগাড়ে খেটে দেখতে দেখতে খাড়া করে ফেলছে একশো ফুট উঁচু যন্ত্রদানবদের।

পাতালঘরে এইভাবে অসীম উৎকণ্ঠা আর যন্ত্রণা সহ্য করে দীর্ঘ আট দিন আট রাত কাটানোর পর নবম দিনে আচমকা একটা শব্দ শুনে দিবানিদ্রা ছুটে গেল আমার। ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখলাম, পাদরি মড়ার মতো পড়ে আছে ভূমিশয্যায়–আর একটা কিলবিলে শুড়-ভাঙা কড়িবরগার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে!

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অনুসরণ করেছিলেন তৎক্ষণাৎ। সুট করে সরে গিয়েছিলাম শুড়ের নাগালের বাইরে–ঘাপটি মেরে ছিলাম কয়লা রাখার ঘরে–নিবিড় তমিস্রার মধ্যে। ধড়াস ধড়াস করছিল উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডখানা–জানি না হতচ্ছাড়া মঙ্গলগ্রহী আমাকেও দেখে ফেলেছে কি না। যদি দেখে থাকে...

আর ভাবতে পারিনি! সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট নিদারুণ আতঙ্ক আমার প্রাণপ্রদীপ সেই মুহূর্তে কেন যে নিবিয়ে দেয়নি–আজও তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

অন্ধকারে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি। কানে ভেসে এসেছিল শুধু টুক টুক টুক করে টোকা মারার শব্দ... তারপর শুনলাম, হিড়হিড় করে ভাঙা জিনিসপত্রের ওপর দিয়ে কী যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাহসে বুক বেঁধে উঠে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে। ফাটল দিয়ে উঁকি মারতেই শিউরে উঠেছিলাম।

বেচারা পাদরি! শুড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে মঙ্গল গ্রহী তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে থেকে।

আঁতকে উঠে পিছু হটে এসেছিলাম কয়লা ঘরের মধ্যে। কয়লা তুলে নিজের গায়ে রেখে আত্মগোপন করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম প্রাণপণে।

ওই অবস্থাতেই শুনলাম নতুন একটা শব্দ। কয়লাঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলাম নিজের হাতে। মঙ্গল গ্রহের প্রাণী দরজার হাতল ধরে মোচড় দিচ্ছে।

উঃ! সে কী মনের অবস্থা আমার। অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছিল বলেই দেখতে পেলাম, হাতলটা ঘুরে যাচ্ছে একটু একটু করে। তারপরেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শুড়ের ঠেলায় খুলে গেল পাল্লা। ফাঁক দিয়ে কিলবিলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কুটিল সর্পের মতো শুড়খানা!

এবং এগিয়ে এল আমার দিকেই! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে ছিটকে সরে গিয়েছিলাম আমি যতখানি তফাতে সরা যায়। কিন্তু ছোট ঘরে এমনিতেই জায়গা নেই–দেওয়ালে পিঠ দিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইলাম আধমরার মতো নিস্পন্দ দেহে।

কিলবিলে শুঁড়টা এগিয়ে এল মেঝের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে, ছুঁয়ে রইল আমার বুটের ডগা। পাছে আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে যায় গলা চিরে, তাই প্রাণপণে আঙুল কামড়ে ধরলাম। হিমেল জঘন্য ওই শুড় যদি আর-একটু এগোয়... অথবা পা সমেত বুটটাকে পাকিয়ে ধরে!

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। এক টুকরো কয়লা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম একদিকে। ঠকাস করে কয়লা গিয়ে পড়ল যেখানে, বিদ্যুৎবেগে শুড়টা ধেয়ে গেল সেদিকে। চক্ষের নিমেষে কয়লাটাকে সাপটে ধরেই সাঁত করে বেরিয়ে গেল বাইরে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা! অখণ্ড নৈঃশব্দ্য নেমে এল কয়লাঘরে!

না, শয়তানসদৃশ সেই শুড় আর হানা দেয়নি কয়লাঘরে। কিন্তু মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে পারিনি আমি পুরো একটা দিন। নিঃসাড়ে পড়ে ছিলাম অন্ধকারে কয়লার গাদায়– তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও নড়বার সাহস হয়নি।

তারপর অবশ্য আর পারিনি। তৃষ্ণা সইতে না পেরে পা টিপে টিপে বেরিয়েছিলাম জলের খোঁজে। গুটিগুটি এসেছিলাম ফাটলটার কাছে...

বাইরে কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। যে গর্তের মধ্যে গেঁথে রয়েছে চোঙাটা, যেখানে গত আট দিন ধরে ব্যস্তসমস্ত থেকেছে মঙ্গল গ্রহের আততায়ীরা–আজ সে গর্ত বেবাক শূন্য। কেউ নেই! কেউ নেই!

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেরিয়ে এসেছিলাম গর্তের মধ্যে। গুটিগুটি উঠে এসেছিলাম গর্তের ওপরে।

দেখেছিলাম ভারী উজ্জ্বল দিনের আলো। আর নীল... ঘন নীল আকাশ। আঃ! কী স্বস্তি! মঙ্গলগ্রহী বিকটদের টিকিও দেখা যাচ্ছে না ধারেকাছে! দূরে দূরে খাড়া আধভাঙা বাড়ি আর গির্জা। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও!

শ্মশান শহরের পথ বেয়ে চারদিকের ভগ্নস্তূপ দেখতে দেখতে ম্লানমুখে অবশ দেহে রওনা হয়েছিলাম লন্ডন শহরের দিকে। যেতে যেতে অন্বেষণ করে গেছি খাদ্য–পেট যে জ্বলে যাচ্ছে। অনাহারে যে আধমরা হয়ে গেছি। বলতে লজ্জা নেই, যেখানে যেটুকু খাবার পেয়েছি, তা-ই খেয়েছি। শরীরে বল পেয়েছি। আবার হেঁটেছি–চোরের মতো–ভয়ে ভয়ে!

আচমকা একটা বেড়ালকে দরজা টপকে পালাতে দেখেছিলাম। বেচারা! মানুষ দেখে আঁতকে উঠছে।

তারপরেই একইভাবে উধাও হতে দেখলাম একটা ধেড়ে ইঁদুরকে।

সন্ত্রস্ত ভীত উৎকণ্ঠিত পৃথিবীর ইতর প্রাণীরাও। আমিও তো ঠিক এইভাবেই দিন কাটিয়েছি কয়লাঘরের অন্ধকারে। কয়লা চাপা দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেছি হাস্যকরভাবে। বেড়াল আর ইঁদুরটার চকিত পলায়ন দেখে এই শিক্ষাই নিলাম আমি। ঠিক। ওদের মতোই, বেড়াল আর ইঁদুরের মতো আনাচকানাচে লুকিয়ে এখন থেকে প্রাণ বাঁচাতে হবে আমাকে। আওয়াজ শুনলেই সটকান দিতে হবে–আড়ালে লুকিয়ে শত্রুর চোখ এড়িয়ে যেতে হবে। শত্রু এখানে মঙ্গল গ্রহের বিদঘুটে প্রাণীরা, প্রথম দর্শনে যাদের একান্ত অসহায় মনে করেছিলাম, তারাই এখন বীরদর্পে বিচরণ করছে পৃথিবীর বুকে–পৃথিবীর মালিক তো এখন থেকে ওরাই। আমরা হেরে গেছি–পালিয়ে আর লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনও গতি নেই আমাদের।

ভাঙা শহর, গ্রাম, কারখানা দেখতে দেখতে আর টলতে টলতে এইভাবেই হাঁটলাম পুরো দুটো দিন, খাবার যা পেয়েছিলাম তা পর্যাপ্ত নয়। পেট ভরেনি–অবসাদও কাটেনি। তবুও

হেঁটেছি মনের জোরে। স্রেফ মনের জোরে–আর দুচোখ দিয়ে দেখে গেছি বর্ণনার অতীত ধ্বংসদৃশ্য। শ্মশান! শ্মশান! শ্মশান হয়ে গেছে এই পৃথিবী।

লন্ডনে পৌঁছেও দেখলাম মহাশ্মশান। সদাচঞ্চল কর্মব্যস্ত প্রাণস্পন্দনে ভরপুর লন্ডন শহর একেবারে মরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। নির্জন পথঘাটে একা একা হেঁটেছি আর নিঃশব্দে কেঁদেছি। মানুষ নেই... মানুষ নেই–এ পৃথিবীতে আর বুঝি জীবিত মানুষ নেই–একা আমি শুধু বেঁচে আছি হৃদয়বিদারক এই দৃশ্য দেখবার জন্যে।

সাউথ কেনসিংটনের কাছাকাছি আসতেই সেই প্রথম শুনতে পেলাম একটা অপার্থিব হাহাকার–উহ-লা! উহলা উহ-লা!

এ আবার কীসের আর্তনাদ? এরকম বিকট অথচ করুণ আর্ত-চিৎকার তো কখনও শুনিনি। অমানবিক কণ্ঠে কে এমনভাবে চেঁচিয়ে চলেছে মরা নগরীর বুকে? প্রেতপুরীর বিকটোল্লাসও বুঝি এমন গা হিম-করা নয়।

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম আমি। উদ্ভ্রান্তের মতো চেয়ে ছিলাম এদিকে

সেদিকে কাছে-দূরে–কিন্তু কাউকে দেখিনি–একাকী অমন কে অমানুষিক আর্তনাদ করে চলেছে, বুঝতেও পারিনি।

ফলে আবার সীমাহীন আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। দৌড়ালাম উন্মাদের মতো দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কোথায় যাচ্ছি, কীভাবে যাচ্ছি–কোনও খেয়াল আর রইল না।

আচমকা দেখতে পেলাম একটা যন্ত্রদানবকে! আতীক্ষ্ণ আর্তনাদটা বেরচ্ছে তারই মাথার বাক্স থেকে–উহ্-লা! উহ্-লা! উহ্-লা!

সহসা স্তব্ধ হল আর্ত-চিৎকার। থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল মৃত্যুপুরীতে। সে যে কী বিপুল শব্দহীনতা তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। অকস্মাৎ বজ্রপাত চেতনার ঝুঁটি পর্যন্ত যেভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়–অকস্মাৎ এই শব্দহীনতাকে শুধু তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

আমি স্তম্ভিত। অবশ। বিমূঢ়।

বিশালদেহী যন্ত্রদানব টলমল করে উঠেই প্রচণ্ড শব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভাঙা ঘরবাড়ির ওপর। নিস্তব্ধ শহর শিউরে উঠল সেই শব্দে।

শিহরিত হলাম আমিও। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তারপরেই পাগলের মতো দৌড়েছিলাম ভূলুণ্ঠিত নিস্পন্দ তেপায়া দানবের দিকে।

কাছে গিয়ে দেখেছিলাম, বাক্সের ঢাকনা খুলে গেছে বিকটাকার মঙ্গলগ্রহীদের অবর্ণনীয় কুৎসিত দেহগুলো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কেউ নড়ছে না। এক্কেবারে নিষ্প্রাণ!

পাশের ছোট টিলাটায় উঠে গিয়েছিলাম হুড়মুড়িয়ে। সেখান থেকে দেখেছিলাম শুধু মড়া আর মড়া! সবই মঙ্গলগ্রহীদের! হেথায়-সেথায় প্রায় গোটা পঞ্চাশেক যন্ত্রদানব হুমড়ি

খেয়ে পড়ে আছে। প্রতিটার মাথার বাক্সের ঢাকনি খুলে গেছে। কিলবিলিয়ে মঙ্গলগ্রহীরা বেরিয়ে এসেছে–কিন্তু নড়ছে না কেউই।

মরেছে প্রত্যেকেই–কীভাবে তা জানি না। কিন্তু প্রাণ নেই কোনও মঙ্গলগ্রহীর দেহেই!

ভেবেচিন্তে কারণ অবশ্য পরে বার করেছিলাম। ঈশ্বর আছেন কি নেই, সে প্রমাণও পেয়েছিলাম। ঈশ্বরই ক্ষুদ্রতম প্রাণীদের বাসস্থান বানিয়েছেন এই পৃথিবীকে। ক্ষুদ্রতম এই প্রাণীদের নাম জীবাণু! তাদের কেউ কেউ মানুষের বন্ধু–কিন্তু রোগজীবাণুরা মানুষের পরম শত্রু। মানুষ তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে–মানুষের শরীর রোগজীবাণুদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখবার প্রতিরোধব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনে আপনা থেকেই গড়ে নিয়েছে।

কিন্তু মঙ্গল গ্রহে তো জীবাণু নেই! শুধু চোখে যাদের দেখা যায় না, অথচ যারা শরীরের ওপর চড়াও হলে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়তে হয়–তাদের জন্যে প্রস্তুত ছিল না মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা। মঙ্গল গ্রহে যদি জীবাণু থাকত, জীবাণুর আক্রমণ সয়ে টিকে থাকবার প্রতিরোধব্যবস্থাও তাদের শরীরে থাকত।

ফলে, পৃথিবীতে পা দিতে-না-দিতে অদৃশ্য জীবাণুরা চড়াও হয়েছে তাদের দেহে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে গেছে। মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করেছে এবং খতম করে দিয়েছে। মঙ্গলগ্রহীদের। জীবাণু আক্রমণ ঠেকানোর কৌশল মানুষ রপ্ত করার আগে মানুষকেও এইভাবে মরতে হয়েছে অদৃশ্য শত্রুদের আক্রমণে। এবার প্রাণবলি দিল আগন্তুক ভিনগ্রহী হানাদাররা!

অদৃশ্য শত্রুর প্রতাপ বুঝে গেল হাড়ে হাড়ে! মাইক্রোস্কোপ ছাড়া যাদের দেখা যায় না যাদের কামান-গোলাবারুদ কিছুই নেই–তাদেরই নীরব অমোঘ আক্রমণ ঠেকাতে পারল না দুর্ধর্ষ দুর্জয় মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা।

ঈশ্বর! তুমি আছ! অবশ্যই আছ!

টেলিগ্রাফ মারফত চকিতে সুসংবাদটা ছড়িয়ে গেল সারা দুনিয়ায়। গির্জায় গির্জায়। নিনাদিত হল ঘণ্টা। সারা ইংল্যান্ড নেচে উঠল খুশির আনন্দে।

আমি তখন কী করছিলাম? ট্রেন ধরে যারা বাড়ি ফিরে আসছিল, তাদের সঙ্গে একটা ট্রেনে উঠে বসেছিলাম। কু-ঝিকঝিক শব্দে বিপুল উল্লাসে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন ছুটে গিয়েছিল মাঠ-বন-প্রান্তর পেরিয়ে, পাইন আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে।

ফিরে এসেছিলাম আমার সুখের কুঞ্জ-নিভৃত গৃহে।

দূর থেকে পাহাড়ে উঠতে উঠতে সজলনয়নে চেয়ে ছিলাম অটুট বাড়িটার দিকে। নির্মম মঙ্গলগ্রহীরা যে কারণেই হোক তাণ্ডবনৃত্য করে যায়নি এদিকে। চিমনিটাই শুধু ভেঙেছে–তার বেশি কিছু নয়।

বাড়ির কাছে এসে দেখেছিলাম, পড়বার ঘরের জানলা যেভাবে খুলে রেখে পলায়ন করেছিলাম–সেইভাবেই খোলা রয়েছে। কাদা-মাখা পায়ে সদর দরজা পেরিয়ে ওপরতলায় উঠেছিলাম–এখনও সেই পায়ের ছাপ হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ির ওপর দিয়ে চাতালে উঠে গেছে। শুকনো পায়ের ছাপের পেছন পেছন ভারী মন নিয়ে উঠে

এসেছিলাম ওপরতলায়। টেবিলের ওপর দেখেছিলাম, খাতাবই যেভাবে খুলে রেখে গিয়েছিলাম, সেইভাবেই ভোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বিষণ্ণ মনে নেমে এসেছিলাম নিচের তলায়। না, কেউ নেই সেখানেও। স্ত্রী হয়তো আমার অবর্তমানে ফিরে এসেছে বাড়িতে–অতি ক্ষীণ এই আশাটাও উধাও হয়ে গেল মন থেকে শূন্য গৃহ স্বচক্ষে দেখবার পর।

তারপরেই ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা।

অস্পষ্ট খেদোক্তি ভেসে এল কানে-বৃথা চেষ্টা। কেউ নেই। কেউ ফেরেনি!

চমকে উঠেছিলাম। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছিল ললাটে। এ কার কণ্ঠ? অতলান্ত দুঃখ কি মুখ দিয়ে প্রকাশ করে ফেলেছি? বিষাদের পাহাড় সরব হয়েছে নিজেরই কণ্ঠস্বরে?

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম, খোলা রয়েছে পেছনের গরাদবিহীন জানলা। কথাগুলো ভেসে এসেছে ওই জানলা দিয়েই!

পরমুহূর্তেই চৌকাঠে আবির্ভূত হল আমার স্ত্রী আর ভায়েরা।

স্তম্ভিত আমরা সকলেই। নির্বাক! নিশ্চুপ! চেয়ে আছি পরস্পরের মুখের দিকে!

তারপরেই বিষম আবেগে দৌড়ে এসেছিল আমার স্ত্রী–ভেঙে পড়েছিল কান্নায়, আমি জানতাম। আমি জানতাম!

এ কাহিনির সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ঘটনা এইটাই। আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম, কেউ আর বেঁচে নেই। স্ত্রী হারিয়েছে আমাকে আমি হারিয়েছি স্ত্রী-কে–জন্মের মতো!

তাই বুঝি দয়ালু ঈশ্বর শেষ চমকটা দিয়ে গেলেন এইভাবে।

তারপর বহু সন্ধ্যা আমরা দুজনে পড়বার ঘরে বসে গল্পগুজব করেছি, কখনও আমি লেখা নিয়ে আর আমার স্ত্রী বোনা নিয়ে তন্ময় থেকেছে–কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনি। আমার মনের মধ্যে মাঝেমধ্যেই কিন্তু গুঞ্জরিত হয়েছে একটা মহা আশঙ্কা

মঙ্গলগ্রহীরা সুদূর মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে হানা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেছে, অন্য গ্রহ থেকে এমনি হানাদাররা পৃথিবীতে এলেও আসতে পারে ভবিষ্যতে।

আমরা কি তার জন্যে তৈরি?

————

[অনুবাদক:

অরসন ওয়েলস মারা গেলেন

গল্পটা প্রথমে শুনেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের কাছে আকাশবাণীতে সাহিত্যবাসরে বারোয়ারি গল্পপাঠের আসরে।

গোটা যুক্তরাষ্ট্রে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গণ-আতঙ্ক! বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ পালাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের ঠেলেঠুলে তুলে দিচ্ছে গাড়িতে, মঙ্গলগ্রহীদের খপ্পর থেকে প্রাণ বাঁচাতে পাগলের মতো হাঁকাচ্ছে গাড়ি। রাস্তাঘাটে বেগে ধেয়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স। বিষ-গ্যাস থেকে বাঁচবার জন্যে নাকে-মুখে ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছে প্রত্যেকেই।

সত্যিই কি মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকারা হানা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে?

না। জর্জ অরসন ওয়েলস ১৯৩৮-এর নভেম্বরে রেডিয়োতে শুনিয়েছিলেন ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ডস-এর রক্ত-জমানো গল্প। মূল বইতে ছিল ইংল্যান্ডের শহরের নাম–উনি তার বদলে বসিয়েছিলেন আমেরিকার শহরের নাম।

তাই এই গণ-আতঙ্ক। আতঙ্ক তাঁদেরই পেয়ে বসেছিল, যাঁরা ব্রডকাস্ট শুরু হয়ে যাওয়ার পর রেডিয়ো খুলেছিলেন। ইন্টারভ্যালে চারবার ঘোষণাও হয়েছিল–অনুষ্ঠানটা নিছক উপন্যাসভিত্তিক। পরে সরকারি তদন্তও হয়েছিল এই ব্যাপারে।

এমনই ছিল অরসন ওয়েলসের জাদুকরি কণ্ঠস্বরের মাহাত্ম। অলীক কাহিনিকে সত্য ঘটনার মতো শুনিয়ে গেছেন।

পৃথিবী থেকে এহেন প্রতিভা বিদায় নিলেন ১০ অক্টোবর ১৯৮৫।]